ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 725-736
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.062

সমরেশ বসুর ‘বিবর’ : নৈতিক সংকট, পাপবোধ ও আত্মদ্বন্দ্বের গল্প

মৌমিতা হালদার, *গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Somresh Basu stands as one of the most prominent figures in Bengali literature, renowned for his writing that poignantly captures the profound crises and contradictions embedded in society. His novel Bivor is a quintessential work, where he delves into the shadowy facets of middle-class existence, moral quandaries, and the inner turmoil concealed within personal lives. Through this narrative, Basu offers a profound exploration of the ongoing societal turmoil and its intricate relationship with human suffering. In Bibor, the protagonist's way of life, psychological state, struggles, and rebellious mindset introduce readers to an altered vision of social reality. Basu's audacious literary perspective, exemplified by his critique of societal conventions and morals, finds clear expression in this novel. While the readers are forced to confront the stark realities of human existence, they are also invited to reassess and view the darker corners of society through a fresh lens. Basu's literary works are an embodiment of humanism amidst the tensions of political, social, and moral conflicts, shedding light on the complexities of life in turbulent times.

Keywords: Samaresh Basu, Bengali Novel, Bibor, Psychological Conflict, Ethical Rebellion, Social Critique, Moral Dilemma.

সমরেশ বসুকে কেউ কেউ বাংলা সাহিত্যের রাজপুত্র বলে অভিহিত করেছিলেন। এই মন্তব্য হয়তো ছিদ্রান্বেষীদের কাছে অতিশয়োক্তি বলে মনে হতে পারে, এবং তাঁরা একে হেলায় উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তবে একথা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই যে, তিনি বাংলা সাহিত্যের আকাশে এক বিশাল বনস্পতির মতোই নিজের প্রতিভার দীপ্তি ছড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক সৃষ্টিশীল শিল্পী, যিনি প্রবল প্রতিকূলতার মাঝেও জীবনযুদ্ধে লড়াই করে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার চূড়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য শুধু বিষয়-বৈচিত্র্যে নয়, রূপ ও প্রকৃতির দিক থেকেও ছিল এক প্রবহমান নদীর মতো—প্রতিনিয়ত বাঁক নেওয়া, নতুন নতুন মোড়ে গিয়ে পৌঁছানো। একইভাবে, তাঁর জীবনও ছিল সমানভাবে বহুমুখী ও গতিশীল। জীবনের প্রতিটি রঙ এবং প্রতিটি অনুভূতি তিনি সাহিত্যে নিপুণভাবে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সমরেশের জীবনদর্শন ছিল সরল অথচ গভীর। তীব্র কোনও নৈতিকতার বোঝা বা আদর্শের কঠোরতায় তিনি নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলেননি। বরং তিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবে স্বতন্ত্র, একজন নির্লিপ্ত জীবনসন্ধানী। তাঁর কাছে জীবন ও সাহিত্য যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই তাঁর সৃষ্টিতে কোনও ভান বা ফাঁকি ছিল না। একবার তিনি নিজেই বলেছিলেন,

> "সাহিত্যের যা কিছু দায়, তা জীবনের কাছেই। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়—এই সত্য উপলব্ধির জন্য সাহিত্যিককে বিশেষ কোনো গভীর সাধনার প্রয়োজন হয় না; জীবন নিজেই এই সত্যকে সতত অতি জীবন্ত করে তোলে।" [১]

এই বক্তব্যে তাঁর সাহিত্যদর্শনের মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমরেশের সাহিত্যে মানুষ সবসময়েই ছিল কেন্দ্রস্থলে। তাঁর রচনার প্রাণ ছিল সেই রক্তমাংসের মানুষ, যারা পুরোপুরি মৃত্তিকাসংলগ্ন। তিনি কখনও কাউকে বাদ দেননি, তাঁদের জীবনের টানাপোড়েনে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নিয়ে এসেছিলেন। মানুষকে গভীরভাবে বুঝতে এবং তাদের তল খুঁজতে, তিনি শরীরী সম্পর্কের বাস্তবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তবে এর ফলে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কাও ছিল প্রবল। সমরেশ জানতেন, জীবনকে পুরোপুরি ধারণ করতে হলে কেবল একজন শিল্পী হওয়া যথেষ্ট নয়, একজন শিকারিও হতে হয়। তিনি ছিলেন সেই জীবনশিকারি—যিনি জীবনের গভীরতম রন্ধ্রে প্রবেশ করে তার রূপ-রস-গন্ধকে গ্রাস করতে জানতেন। সমরেশ বসুর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছিল 'নয়নপুরের মাটি' দিয়ে, যা তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্ব বা **'উদয়ন পর্ব'** হিসেবে পরিচিত। যদিও তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ছিল **'উত্তরঙ্গ',** যা রচনাকালের দিক থেকে দ্বিতীয়। শুরুর দিন থেকে শেষ অবধি তিনি কখনও এক জায়গায় থেমে থাকেননি। বারবার দিক পরিবর্তন করেছেন, উপন্যাসে যুক্ত করেছেন নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিক। তাঁর সৃষ্টিশীলতার এই গতিশীলতাই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অনন্য করে তুলেছে।

সমরেশ বসু, একাধারে জীবনশিল্পী এবং জীবনশিকারি, সাহিত্যকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য শুধু পড়ার জন্য নয়, বোধগম্য করার জন্যও। সাহিত্যের এই তীব্রতা ও অন্তর্গত সত্যকেই তিনি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রাজনগরে ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমরেশ বসু। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল সুরথনাথ বসু। তবে পরবর্তীকালে তাঁর বন্ধু এবং শ্যালক দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁকে একটি নতুন নাম প্রদান করেন— সমরেশ বসু। সেই নামেই তিনি সাহিত্যজগতে নিজের পথচলা শুরু করেন এবং সমগ্র জীবনব্যাপী এই নামেই পরিচিত হন। সমরেশ বসুর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে, যখন 'পরিচয়' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' প্রকাশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং পরিমল গোস্বামীর মতো তৎকালীন বিশিষ্ট লেখকদের পাশাপাশি তাঁর এই গল্প স্থান পায়। গল্পটি ভারতবর্ষের প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত একটি অনন্য খণ্ডচিত্র।

সমরেশ বসু তখন ছিলেন নবীন লেখক, কিন্তু তাঁর লেখনীতে সামাজিক সংকীর্ণতা বা প্রচলিত রীতির কোনো ছাপ ছিল না। বরং, তাঁর সৃষ্টিকর্মে ফুটে উঠেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি গভীর আস্থা এবং মানবতার প্রতি অগাধ প্রেম। 'আদাব' গল্পটির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, সাহিত্য শুধুমাত্র বিনোদনের

মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চেতনার গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। পরবর্তীকালে, দীর্ঘ চার দশকেরও অধিক সময় ধরে সমরেশ বসু গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের লেখনীকে আধুনিকতার স্পর্শ দিয়েছেন, কিন্তু কখনোই তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিবাদী মানসিকতা বা সাহসী বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটাননি। তাঁর লেখার ভাষা যেমন সহজবোধ্য, তেমনই তীক্ষ্ণ। তিনি সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন এবং মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

ষাটের দশকে সমরেশ বসু তাঁর রাজনৈতিক আদর্শিক যাত্রায় এক গভীর মোড় নেন। দীর্ঘদিন ধরে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, এই সময় তিনি ক্রমশ পার্টি থেকে দূরে সরে আসেন। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নৈতিক আদর্শের বিষয়ে মতানৈক্য তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় সংশয় এবং দ্বন্দ্ব, যা তাঁকে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বিপন্নতার মুখোমুখি করে। রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দায়বদ্ধতার দ্বন্দ্ব, পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনের জটিলতা, তাঁর জীবনে এক চরম বিপর্যয়ের সূচনা করে। সমাজ, সংসার, রাজনীতি, এমনকি দাম্পত্য জীবনেও চরম তিক্ততা এবং বিরূপ পরিস্থিতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আজীবন মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর আস্থা এবং বিশ্বাসের সংকট দেখা দেয়। ব্যক্তিজীবনের সীমাবদ্ধতা ও টানাপোড়েনের মধ্যেও সমরেশ বসু আশ্রয় খুঁজে পান তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে। নিজের অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটে তাঁর লেখনীতে, যা হয়ে ওঠে সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতার এক বিশ্লেষণ।

এই সময়ে লেখা তাঁর দুটি বিখ্যাত উপন্যাস—'বিবর' ও 'প্রজাপতি'—তাঁর ব্যক্তি-জীবনের গভীর অভিজ্ঞতার ফসল। এই উপন্যাসগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সংকট ও মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি, যা সাহিত্যিক মহলে তীব্র আলোচনার জন্ম দেয়। সমালোচকদের একাংশ 'বিবর'-এর শৈলী ও বিষয়বস্তু নিয়ে তীব্র আপত্তি জানান। কেউ কেউ একে 'কাঁচা, কদর্য এবং অশ্লীলতার প্রবাহ'(২) বলে চিহ্নিত করেন, আবার কেউ একে 'অসুস্থ ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন'(৩) হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তবে এই সমালোচনার মধ্যেও সমরেশ বসু তাঁর সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 'বিবর' এবং 'প্রজাপতি' উভয়ই বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি একদিকে মানবজীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ এবং ভণ্ডামিকে নির্মমভাবে উদঘাটন করেছেন। তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবন, যন্ত্রণা এবং তাঁদের অস্তিত্বের সংগ্রাম।

সমরেশ বসু এই সময় প্রমাণ করেন যে, একজন সৃষ্টিশীল লেখক ব্যক্তিজীবনের সীমাবদ্ধতা এবং সংকট অতিক্রম করে সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে চিরন্তন মানবিক সত্যকে স্পর্শ করতে পারেন। তাঁর সাহিত্যে তাই কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজ ও মানুষের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও সত্যের প্রকাশ। সমরেশ বসু কেবল একজন সাহিত্যিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন মননশীল চিন্তক, যাঁর সাহিত্য সমাজের গভীর বাস্তবতাকে ছুঁতে জানত। তাঁর লেখনী আজও পাঠকের হৃদয়ে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বয়ে আনে।

সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনের এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটে উপন্যাস 'বিবর'-এর মাধ্যমে। বাংলা কথাসাহিত্যে এই উপন্যাসটি এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী সৃষ্টি, যা সমকালীন সমাজের জীবনচিত্রকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করেছে। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসে সমরেশ বসু বাঙালি মধ্যবিত্ত

সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিকে একধরনের চ্যালেঞ্জ জানান। এটি ছিল তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা, যেখানে সাহিত্যের প্রচলিত কাঠামো এবং নৈতিকতার ধারণাগুলি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠে।

সমরেশ বসু নিজেই এই সময়ের পটভূমি এবং নিজের মানসিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> 'নিজের এবং অনেকের লেখা পড়েই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার ধারণা বাঙালি পাঠক সমাজেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।'[৪]

এই মন্তব্য তাঁর মানসিক বিদ্রোহ এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়। ১৯৬৫ সালের প্রেক্ষাপটে, যখন সাগরময় ঘোষ তাঁকে পূজো সংখ্যার জন্য একটি উপন্যাস রচনার অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন,

> 'সব প্রচলিত প্রথা ভেঙে দিতেই এবার আমি লিখতে চাই।'[৫]

কিন্তু তাঁর চিন্তার জগৎ ছিল আরও গভীর এবং বহুমাত্রিক। তিনি পরে বলেছিলেন,

> ''অবশ্যই, কেবল প্রচলিত প্রথাকে ভাঙার কথাই তো চিন্তা করিনি, চিন্তার জগতেও একটা ওলট-পালট চলছিল।''[৬]

'বিবর' সেই ওলট-পালট চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। এটি কেবল একটি উপন্যাস নয়, বরং সমরেশ বসুর মানসিক বিবর্তনের এক উজ্জ্বল দলিল। এই উপন্যাসে তিনি সাহিত্যের প্রচলিত রীতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন এবং এক নতুন ধরণের বয়ান প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজের প্রথাগত মানসিকতা এবং ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছেন এবং সেই বিদ্রোহের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখার প্রতিটি শব্দে। 'বিবর' কেবলমাত্র গল্প বলার মাধ্যম নয়; এটি বাংলা সাহিত্যের গভীরে চিন্তার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্ব, আশেপাশের জগৎ, আর সেই জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক—সবকিছুই অসাধারণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন সমরেশ। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, এবং আত্মজিজ্ঞাসার তীব্র ধ্বনি। সমরেশ বসুর সাহসী সাহিত্যকর্ম 'বিবর' তাই কেবলমাত্র একটি সাহিত্যিক অভিজ্ঞান নয়, এটি একধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিপ্লব। বাংলা কথাসাহিত্যে এটি এক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে, যা আজও পাঠকদের মুগ্ধ করে এবং নতুন ভাবনার সঞ্চার করে।

দ্রুত অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজে ব্যক্তি মানুষের বিপর্যস্ত পাপপুণ্যবোধ, তার অসহায় ক্ষোভ, এবং দুর্দমনীয় ক্রোধের চিত্রায়ণ—এমনই নির্মম ও তীক্ষ্ণ আলেখ্য হল সমরেশ বসুর উপন্যাস 'বিবর'। এটি সেই মধ্যবিত্ত জীবনের গভীর, পিচ্ছিল, জটিল, এবং অন্ধকারময় দিকগুলি তুলে ধরে, যেখানে জীবিত সরীসৃপের মতো প্রবৃত্তি, অসহায়তা, এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রতিটি চরিত্রের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাংলা সাহিত্যে 'বিবর' মধ্যবিত্ত পাঠকদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। এটি এমন একটি উপন্যাস, যা প্রচলিত রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মানুষের অন্তর্গত সংকট এবং সামাজিক অবক্ষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে। একদিকে এই রচনা বহুল প্রশংসিত, অন্যদিকে এটি সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। প্রয়াত সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষ 'বিবর'-কে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাসের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এটি সাহিত্যের উচ্চ শিখরে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে, অনেক পাঠক ও সমালোচক এই উপন্যাসকে অশ্লীল বলে নিন্দা করেছেন।

তবে, সমালোচনা এবং প্রশংসার এমন তীব্র পরস্পরবিরোধিতা শুধুমাত্র সেইসব সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেগুলি প্রকৃত অর্থে নতুন, তীব্র, এবং অপ্রতিরোধ্য। 'বিবর' এমন একটি রচনা, যা মানুষের অস্তিত্বের গভীর সংকটকে সামনে নিয়ে আসে এবং প্রচলিত মূল্যবোধের আরামের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসতে উন্মুখ এক প্রতিবাদী সত্তার কাহিনি তুলে ধরে। সমরেশ বসু এই উপন্যাসে শুধু সমাজের উপরিতল নয়, বরং তার গভীরে লুকিয়ে থাকা জটিল, কালো অধ্যায়গুলিকে উন্মোচন করেছেন। 'বিবর'-এ তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে মানুষ নিজের অন্তর্জগতের অন্ধকার, নৈতিক দ্বিধা, এবং সমাজের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নির্মম সত্যগুলির মুখোমুখি হয়। এটি কেবল একটি গল্প নয়, বরং মানবজীবনের অস্তিত্বের অন্তঃসারশূন্যতা এবং তার গভীর সংকটের বহিঃপ্রকাশ।

'বিবর'-এর মতো একটি সাহসী এবং ভিন্নধর্মী রচনা, যা প্রচলিত সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে অস্থিরতা সৃষ্টি করে, সেটি যে একই সঙ্গে বহুল নিন্দিত এবং বহুল প্রশংসিত হবে, তা অনিবার্য। এটি বাংলা কথাসাহিত্যের এমন এক মাইলফলক, যা পাঠকদের কেবল মুগ্ধ করেনি, বরং তাদের চিন্তায় এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

'বিবর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, যাকে আমরা নায়ক হিসেবে দেখছি, তার পরিচয় কোনো নির্দিষ্ট নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই নামহীন চরিত্রটি একদিকে তার নিজস্ব পরিসরে বিচ্ছিন্ন এবং একাকী, অন্যদিকে তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। তিনি একজন মদ্যপ, লম্পট এবং স্বেচ্ছাচারী, যাঁর জীবনে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই। তাঁর চরিত্রের ভেতর কোনো ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা প্রথাগত শৃঙ্খলা নেই, বরং তিনি এক ধরনের অশ্লীল ভোগবিলাসের মধ্যে মগ্ন থাকেন। যদিও তাঁর সংসারে অর্থাভাব নেই, তবুও তিনি অফিসে ঘুষ গ্রহণ করেন, যার মাধ্যমে তিনি সামাজিক অঙ্গীকারের প্রতি একধরনের অঙ্গীকারহীনতা প্রদর্শন করেন। তাঁর জীবন এক অন্ধকার পথে এগিয়ে চলে, যেখানে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই।

তবে, যখন তাঁর মধ্যে নৈরাশ্যবোধ এবং একাকীত্ব প্রবল হয়ে ওঠে, তখন তিনি এক নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হন—এক প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে। এটি তাঁর জীবনের এক অদ্ভুত উলট-পালট। সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রকে নিয়ে একটি গভীর পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা উপন্যাসের মূল ধারণার প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দেয়। তিনি বলেছেন,

> "আসলে 'বিবর' আমাদের ঔপনিবেশিক বিকৃত ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ সামগ্রিক। এই কারণে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়েও সমগ্র।"[৭]

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, এই নামহীন চরিত্রটি শুধু নিজেকে নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাঁর প্রতিবাদ শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজের বৃহত্তর কাঠামো ও আদর্শের বিরুদ্ধে এক গুরুতর প্রশ্নবোধক চিহ্ন। উপন্যাসে, এই চরিত্রটির প্রতিবাদ রাষ্ট্রের শাসন, সমাজের কাঠামো এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের প্রতি একধরনের বিদ্রোহের রূপ নেয়।

এই বিদ্রোহ কোনও নির্দিষ্ট দেশ বা সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সর্বজনীন এবং চিরকালীন একটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, যা সমাজের শাসন, আদর্শ এবং মানুষের স্বাধীনতার সংকটে আছন্ন হয়ে ওঠে।

সমরেশ বসু এর মাধ্যমে সমাজের বাইরের এবং ভেতরের অন্ধকারগুলোকে উন্মোচন করেছেন, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং তার প্রতিবাদী সত্তা এক বৃহত্তর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুক্ত হয়ে ওঠে। 'বিবর' সেই প্রতিবাদের এক অভূতপূর্ব সাক্ষ্য, যেখানে ব্যক্তির সংকট এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

'বিবর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের প্রেমিকা, নীতা, একজন সুন্দরী এবং শিক্ষিত নারী, তবে তার চরিত্রে রয়েছে এক ধরণের দ্বৈততা। নীতা একদিকে প্রেমিক নায়কের প্রতি আকৃষ্ট হলেও, অন্যদিকে তাঁর জীবনে একাধিক পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে। নায়ক, যদিও এই অপ্রিয় সত্য জানে, তবুও সে এক অদ্ভুত আকর্ষণে নীতার প্রতি নিজেকে বন্ধী করে ফেলেছে। নীতার আহ্বানে, নীতার ইচ্ছায় সে তার জীবনে প্রবেশ করেছে এবং নীতার প্রতি তার পরাধীনতা মেনে নিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, নায়ক নিজে চরিত্রহীন হলেও, নীতার চরিত্রহীনতা তাকে সহ্য করতে পারেনি। যদিও সে নিজে সমাজের সীমানায় ঊর্ধ্বে থাকতে পারেনি, তবুও নীতার দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ এক আশ্চর্য ঘূর্ণন সৃষ্টি করে। নীতার সঙ্গে কথোপকথন করতে করতে, নায়কের মধ্যে এক ধরনের তীব্র প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তার প্রেমিকা, যাকে সে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে দেখেছিল, সেই নীতা যদি চরিত্রহীন হয়, তবে তাকে নিজেই অবসান ঘটাতে হবে।

নায়ক শেষ পর্যন্ত নীতাকে হত্যা করে। এটি তার নিজের একাকীত্ব এবং সমাজের প্রতি অসন্তুষ্টির প্রকাশ, যেখানে সে যৌন পরাধীনতার বিরুদ্ধে এক কঠোর প্রতিবাদ জানায়। নীতাকে হত্যা করে, সে নিজেকে এবং তার সমাজকে এক ধরণের মুক্তি প্রদান করেছে, এক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তবে, নীতা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নায়ককে বলেছিল যে, সে তাকে ভালোবাসে। এই শেষ মুহূর্তে, নায়ক তার প্রেমিকার প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখায়নি। সে তার নিজস্ব আদর্শ এবং সত্তার তাগিদে নীতাকে হত্যা করেছে, যা তার চরিত্রের এক চরম পরীক্ষা হিসেবে উঠে আসে।

সমরেশ বসু এই উপন্যাসের মাধ্যমে নীতা এবং নায়কের চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সমাজের চারিত্রিক অবক্ষয়ের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষত, উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা শহরের আধুনিক যুব সমাজের মধ্যে, যাদের মধ্যে একদিকে রয়েছে নৈতিকতার প্রতি অবহেলা এবং অন্যদিকে রয়েছে সম্পর্কের অস্থিরতা। নীতা এবং নায়ক দু'জনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের সেই বিকৃত দিকগুলোকে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে প্রেম, ভালোবাসা এবং যৌনতা শুধু শারীরিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানুষের মানসিক এবং নৈতিক অন্ধকার দিকগুলোও উন্মোচন করে।

'বিবর' উপন্যাসের মাধ্যমে সমরেশ বসু সমাজের এক গভীর সংকটকে তুলে ধরেছেন, যেখানে আধুনিকতার নামে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্ক এবং চারিত্রিক মূল্যবোধগুলো ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই উপন্যাসে প্রেম ও সম্পর্কের মানসিকতা, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব এবং নৈতিকতার সংকট এক উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সমরেশ বসু 'বিবর' উপন্যাসে একটি চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন যা স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে তুলে ধরে। তিনি লেখেন,

"এক তুখোড় চতুর একগুঁয়ে জেদি আর অব্যর্থ শিকারী, একটা বাঘকে ফাঁদে ফেলে মারবার জন্য, যেন এক্তা নধর পুষ্ট ছাগলকে, রাতের অন্ধকারে বনে, গাছের তলায় বেঁধে রেখে দিয়েছিল। আর বাঘটা তার শিকারের ডাক শুনে, গন্ধে গন্ধে, পা টিপে টিপে এল, বন চুঁড়ে চুঁড়ে দেখল। দেখে, খেলতে আরম্ভ করলো।"(৮)

এই চিত্রকল্প প্রথমে একধরনের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন সত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করে, যেখানে বাঘটি শিকার ধরার স্বাধীনতা অনুভব করে, কিন্তু আসলে, তাকে তার শিকারী শিকার করবে, যিনি তাকে সুচতুরভাবে লক্ষ্য করে এবং ফাঁদে ফেলবে। এর মাধ্যমে লেখক স্বাধীনতার প্রতি এক রুক্ষ বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, যেখানে স্বাধীনতা হতে পারে শুধু একধরনের ধোঁকা, কারণ প্রকৃতপক্ষে, সে পরাধীন।

এই চিত্রকল্পের মাধ্যমে সমরেশ বসু স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। বাঘের মতো, যাকে মনে হয় তার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সে জানে না যে এক গভীরভাবে নক্সা করা ফাঁদে সে আসলেই পরাধীন। এরই মাধ্যমে, লেখক পাঠককে বুঝাতে চান যে, অনেক সময় আমরা যা ভাবি বা যা আমরা মনে করি, তা আমাদের আসল বাস্তবতার থেকে বহু দূরে থাকতে পারে, কারণ সমাজ, পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলোর উপর আমাদের সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ডগুলোই প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

নীতাকে খুন করার প্রসঙ্গে সমালোচক অশ্রুকুমার শিকদার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

"খুন যেন সে নিজে করেনি, - 'কনুইটা যত নষ্টের গোড়া' - যেন ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধও লুপ্ত। সমস্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে তার নৈরাজ্যময় আক্রোশ, তারই ফল নীতার নিষ্কারণ হত্যা।"(৯)

এর মাধ্যমে শিকদার দেখাতে চেয়েছেন যে, নায়ক নীতাকে খুন করার সিদ্ধান্ত একান্তভাবে তার ব্যক্তিগত নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিস্থিতির ফলস্বরূপ। তার চারিত্রিক অবক্ষয়, নৈরাজ্য এবং মূল্যবোধের সংকটই তাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য করেছে।

নায়কের মধ্যে নীতাকে খুন করার কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। তাঁর প্রতি গভীর আকর্ষণ এবং নীতার প্রতি এক অদৃশ্য টান তাকে বারবার তার নিজের চরিত্র এবং মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘর্ষে ফেলে। নায়ক নিজেই স্বীকার করে বলেছেন,

"আমার পক্ষেও এরকম হওয়া বিচিত্র ছিল না। রাত্রি দশটার পর যে কি স্থির করে বসতাম, তা আমি সন্ধ্যায় কিছুই জানতাম না"। (১০)

এই আত্মসমালোচনার মধ্যে রয়েছে নায়কের নিজের প্রতি এক ধরণের অক্ষমতা এবং স্বীকৃতি যে, তার অস্থিরতা এবং নৈতিক দ্বিধা তাকে কখনোই স্থির হতে দেয়নি। তাঁর চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং বিপরীত অনুভূতি তার কাজের প্রভাব ফেলেছে, যা তাকে একেবারে নৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করেছে।

এছাড়াও, নায়ক আরও একবার আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে বলেছে, সকলেই গর্তের মধ্যে আছে। তার বাবাও তার নিজ গর্তের মধ্যে ভালই আছে, যেখানে পাপ পূণ্যের কোন প্রশ্নই নেই। এখানে নায়ক নিজের সংকট এবং পরিবেশের প্রতি এক গভীর অনুধাবন প্রকাশ করেছে, যেখানে সে দেখে, মানুষ আসলে

নিজের সংকটের মধ্যে আটকে থাকে, এবং তার পরিবারের সদস্যরাও তার মতোই সেই সংকটে বন্দী। এখানে পাপ এবং পূণ্য নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ যে সমাজে তিনি বাস করছেন, সেখানে সত্য এবং নৈতিকতার ধারণাগুলো ধোঁয়াশা হয়ে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে, 'বিবর' উপন্যাসের নায়ক চরিত্রটি আত্মসমালোচনার এক প্রকৃত রূপ ধারণ করে, যা তাকে তার চারিত্রিক এবং সামাজিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সমাজের কাঠামো, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সংকটগুলোর মধ্য দিয়ে নায়ক এক পৃষ্ঠায় তার নৈতিক পতন ও পরিবর্তনকে চিত্রিত করে, অন্যদিকে এটি পাঠককে তার নিজস্ব পরিচয়ের প্রতি প্রশ্ন উঠাতে উদ্বুদ্ধ করে।

উপন্যাসের নায়ক গভীর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে সমাজের পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার প্রতি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেছেন। তিনি সমাজে চলমান যৌন অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যেখানে সমাজের তথাকথিত অভিজ্ঞান এবং নৈতিকতার স্তম্ভগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। নায়কের পর্যবেক্ষণে, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং পরিচিত ব্যক্তিরা প্রায়শই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক স্খলন ঘটাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আইনজীবী হারান নিয়োগী, যিনি সমাজে খ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তার বহু উপপত্নী রয়েছে। তেমনি, নায়কের আর্টিস্ট বন্ধু হীরেনও অবৈধ সম্পর্কের দিকে ঝুঁকেছে, যা তার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অন্ধকার দিক তুলে ধরে।

অফিসের বস মি. চ্যাটার্জী, যিনি প্রথম পক্ষের পুত্রের সঙ্গে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে সন্দিহান, প্রায়শই তার স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটাতে শুরু করেন। এমনকি, নায়কের এক বন্ধু, যিনি একটি নামী কোম্পানিতে উচ্চ পদে কর্মরত, তারও ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, অফিসের মহিলা স্টেনোগ্রাফারের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। নায়ক এই সকল সামাজিক এবং নৈতিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অন্তঃসারশূন্যতা, ভণ্ডামি, এবং শিক্ষিত সমাজের ভ্রষ্টতা নিয়ে বিদ্রুপ করেছেন। তার মতে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে মিথ্যাচার, প্রতারণা এবং কপটতা ছড়িয়ে পড়েছে, যা সমাজের নৈতিক অধঃপতনের একটি উদাহরণ।

নীতার পরিচারিকা চিত্রা, যে হোটেলে গণিকাবৃত্তির জন্য বহুবার ধরা পড়েছে, তার জীবনও সমাজের আরেকটি অন্ধকার দিক তুলে ধরে। নীতার মতো চিত্রাও একাধিক পুরুষের সঙ্গে শয্যাসঙ্গী। এর পাশাপাশি, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্রমহিলা রুবী দত্ত তার অফিসের বসের সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত, যা সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। নায়কের নিজের বোন, বিদিশা, নিজেও এই অধঃপতনের বাইরে নয়।

এই সমাজে, যেখানে প্রতারণা, অশ্লীলতা, এবং অস্বচ্ছতা সাধারণ হয়ে গেছে, সেখানে নায়ক এক ধরনের অস্থিরতা এবং হতাশা অনুভব করেন। তাঁর মতে, এমন একটি সমাজের মধ্যে বিবাহের মত পবিত্র সম্পর্কও অর্থহীন হয়ে পড়েছে, কারণ এটি এক দীর্ঘস্থায়ী প্রতারণার ফলস্বরূপ। এমনকি, নায়ক মনে করেন যে, সমাজের এই পরাবাস্তবতার চেয়ে পতিতাবৃত্তি অনেকটাই কম নিকৃষ্ট। সামাজিক এবং নৈতিক অবক্ষয়ের এই চিত্রই উপন্যাসে উঠে এসেছে, যা সমাজের ভিতরে চলমান ভয়াবহ মূর্তিমান বাস্তবতার প্রতিফলন।

এভাবে, সমরেশ বসু 'বিবর' উপন্যাসে একটি গহীন বিশ্লেষণ করেছেন সমাজের চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয়, যেখানে মানবিক মূল্যবোধ, পারিবারিক সম্পর্ক এবং নৈতিক শুদ্ধতা একে একে ভেঙে পড়ছে।

সমাজের এই অন্ধকার দিকগুলো তার লেখায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, যা পাঠকদের এক গভীর চিন্তা ও আত্মসমালোচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

উপন্যাসের নায়ক এক সময় জৈবিক চাহিদা এবং সংকটের শিকার হয়ে 'বিবর'-এ আবদ্ধ ছিল। তবে নীতাকে খুন করার পর, এই বিবর থেকে তার মুক্তি ঘটে। নায়কের এই মুক্তি শুধু শারীরিক দিক থেকেই নয়, বরং এটি তার আধ্যাত্মিক এবং মানসিক মুক্তির প্রতিফলনও। নায়কের স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয়ের অনুভূতি তাকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। তবে, এই মনুষ্যত্ব অর্জন কোনো সহজ প্রক্রিয়া ছিল না; এটি ছিল সমাজের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ, যা তাকে নানান সংগ্রামের সম্মুখীন করেছিল। নায়কের চাকরি হারানোর পেছনে ছিল তার সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কিন্তু তাতে তার সংকল্প বিন্দুমাত্র কমেনি।

তিনি তার বিবর থেকে মুক্তি পেয়েছেন, সেই সঙ্গে তার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, নায়ক তার একান্ত নিজস্ব গর্ত থেকে বাইরে আসার প্রয়াসে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যা একসময় তাকে অনাবশ্যকভাবে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল, এখন তার জীবনের পুঁথিগত নীতির প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম দেয়। এই স্বাধীনতা তাকে অন্যদের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের শিথিলতা, ভণ্ডামি এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলে।

উপন্যাসের কাহিনি মূলত মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ভাঙন, পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, এবং ব্যক্তিগত স্তরে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার চিত্র তুলে ধরে। বিশেষভাবে, নায়কের প্রেমিকা নীতা সম্পর্কিত তার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, যেখানে সে অকপটে স্বীকার করে,

> "হ্যাঁ মশাই, নীতাকে আমিই খুন করেছি, কারণ আমি তার, কি বলে, আসক্তি আর মিথ্যের সঙ্গে ঠিক পেরে উঠছিলাম না।" [১১]

এই খুনের পেছনে মূলত নায়কের নিজস্ব মূল্যবোধ এবং সত্যের প্রতি তার অনড় বিশ্বাস কাজ করেছে। নায়ক জানে, তার এই হত্যা এক ধরনের আধ্যাত্মিক এবং মানসিক মুক্তি, যেখানে সে নিজেকে মিথ্যাচারের আবর্ত থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়।

এই প্রেক্ষিতে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থভাবেই বলেছেন,

> "মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখানে শ্রেণী হিসাবে তার সব তাৎপর্য হারিয়েছে, - 'বিবর' সে কথাই ঘোষণা করে।"[১২]

অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত সমাজ, যা একসময় নৈতিকতার রক্ষক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকত, এখন তার ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা সামাজিক এবং পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে একটি শূন্যতাকে সৃষ্টি করেছে, যা ভণ্ডামি, প্রতারণা এবং মিথ্যাচারে পূর্ণ। সমরেশ বসু 'বিবর'-এর মাধ্যমে এই শ্রেণির অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় এবং তার প্রতিফলন সমাজে কীভাবে এক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করেছে, তা চিত্রিত করেছেন।

এভাবে, নায়ক একের পর এক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার পরিচয় ও নৈতিকতার সন্ধান করছে। সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত, এবং তার ব্যক্তিগত জীবনে তার যাত্রা এক ধরনের বৃহত্তর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর আলোকপাত করে, যা 'বিবর'-কে একটি গভীর বিশ্লেষণমূলক সাহিত্যকর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সমরেশ বসু তাঁর 'আর রেখো না আঁধারে' প্রবন্ধে সাহিত্যের অশ্লীলতা প্রসঙ্গে একটি গভীর মন্তব্য করেছিলেন, যা তাঁর সাহিত্যচিন্তার এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। তিনি বলেছিলেন,

> ''জীবন যদি অন্ধকারে থাকে, তাকে অন্ধকারেই রাখতে হবে কেন? আলোয় আনতে গেলে পেচক শৃগাল চিৎকার করবে, করুকই না, তবুও অন্ধকারে যেন না থাকতে হয়।'' (১৩)

এই উক্তিটি তার একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে, যেখানে তিনি মনে করেন, যে কোনো পরিস্থিতিতে সত্য বা বাস্তবতার আলোয় মানুষকে আনা উচিত, এবং সে পথের কষ্ট বা প্রতিবন্ধকতা পরোয়া না করে, অবশেষে অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়ানোই শ্রেয়। এই বক্তব্যের মাধ্যমে সমরেশ বসু এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটান, যা সাহিত্যের অন্ধকারমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা দেয়।

একইভাবে, সমরেশ বসু সাহিত্যে অশ্লীলতা এবং তার প্রতি তথাকথিত নীতিগত চিন্তাধারার আপত্তি সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ মন্তব্যে আরও খোলাখুলি প্রকাশ করেন। তিনি 'আর রেখো না আঁধারে' প্রবন্ধে বলেছিলেন,

> ''আসলে সাহিত্যে অশ্লীলতা খুঁজে যারা বিচলিত, শুচি শুচি করে মরছে, তারা জীবনের ক্ষেত্রে পাপ সৃষ্টির প্রতি চোখ ফিরিয়ে রাখতে চাইছে, তাদেরাই সেই স্বাধীনতা অর্জন করছে যে তারা জীবনে যা খুশি করবে আর পাপবোধের কথা না ভাবতে চাইছে। এমনকি সত্যের চেহারাকেও তারা ভয় পায়।'' (১৪)

এই বক্তব্যে সমরেশ বসু খুব স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যারা সাহিত্যে অশ্লীলতা খুঁজে বেড়ান এবং সেগুলোর জন্য সমাজে নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন, তারা আসলে বাস্তব জীবন এবং তার অন্ধকার দিকগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে চান। তারা তাদের নিজস্ব জীবন ও চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত অস্বস্তি বা পাপবোধ থেকে মুক্ত থাকতে চান। তবে, তাদের এই নিজস্ব স্বার্থপরতা এবং ভীতি একে অপরকে স্তব্ধ করে দেয়, এবং বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানোকে তারা ভয় পায়।

এরপর, তিনি সাবধানবাণী হিসেবে বলেছিলেন,

> ''আশেপাশে যা ঘটছে, তা যেন তারা ধামাচাপা দিতে পারে, আর তারাই মূলত 'আত্মদর্শনের আতঙ্ক' এর শিকার।''(১৫)

সমরেশ বসুর মতে, সমাজে ঘটে চলা নৈতিক অবক্ষয় বা অশ্লীলতার প্রকৃত জগতের মুখোমুখি হওয়ার আতঙ্ক তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের মূল সমস্যা হলো, তারা যেটি ধামাচাপা দিতে চাইছে, সেটি আসলে আত্মপরিচয়ের মুখোমুখি হওয়া, বা নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। তাদের এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি, তারা তাদের ভয়ে অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করেন, এবং সাহিত্যের এমন চিত্রগুলির সাথে সমঝোতা না করে এগুলিকে অশ্লীল হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সমরেশ বসুর এই বাণীটি সাহিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকা এবং মানবিক আত্মদর্শনের প্রয়াসকে তুলে ধরে। তিনি বিশ্বাস করেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জীবন এবং সমাজের সত্য ও বাস্তব দিকগুলি সামনে আনা, যা অনেক সময় অস্বস্তিকর হতে পারে, তবে তা পরিহার করা নয়, বরং গ্রহণ করা উচিত।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, 'বিবর' উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই তার ইড (ID) বা মানসিক স্তরের নিম্নতম আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, প্রবৃত্তি এবং অসীম ক্ষুধা দ্বারা চালিত। প্রেম, কাম, রাজনীতি, জীবিকা, এবং সমাজ—এই সমস্ত জীবনসংগ্রামের নানা দিকের মধ্যে যে অস্থিরতা এবং বিভ্রান্তি রয়েছে, লেখক সেখানে যেন তাদের মূল উৎসকে খুঁজে বের করেছেন, এবং সেই কুয়াশাচ্ছন্ন আবেগ এবং মানসিক অবস্থা দিয়ে চরিত্রগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। লেখক তাদের মধ্যে গাঢ় আত্মবিশ্বাস এবং অপরাধবোধের দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। 'বিবর' এর বন্য স্বাধীনতা, যা প্রথমে নায়ককে উন্মুক্ত এবং নির্ভীক করে তোলে, পরবর্তীতে পরাধীনতা বা মানসিক সচেতনতা (CONSCIENCE) দ্বারা প্রতিরোধিত হয়ে একটি সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়, এবং এটি চরিত্রটির শেষ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

সমরেশ বসু ষাটের দশকের কলকাতার শহুরে জীবনের একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, হতাশা, এবং সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পতনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন। সেই সময়কার অবস্থা এবং মানবিক দুর্দশা তার লেখনীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, এবং 'বিবর' সেই সব হতাশাগ্রস্ত, নিঃস্ব এবং ভগ্নপ্রায় মানুষদের কাহিনী হয়ে উঠেছে। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে শোষিত, নিপীড়িত মানুষের দুঃখ এবং তাদের আত্মনির্ভরতার প্রয়াসও এখানে স্থান পেয়েছে।

লেখক এই উপন্যাসের মাধ্যমে মানব জীবনের চরম ক্ষয় এবং মানসিক অধঃপতনকে তুলে ধরেছেন, যেখানে একদিকে মানুষ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়, অন্যদিকে সে পুনরুত্থানের জন্য সংগ্রাম করে। 'বিবর' একদিকে একটি হতাশার প্রতীক হলেও, অন্যদিকে এটি এক ধরনের পুনর্জন্মের কথাও বলে—যেখানে নায়ক ও অন্যান্য চরিত্রগুলি মানবিক দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, যেন তারা জীবনের শক্তিকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে পারে। লেখক শুধু 'বিবর' এর চরিত্রদের সংকটের দিকেই মনোযোগ দেননি, বরং তিনি তার অন্যান্য রচনায়, যেমন 'দেখি নাই ফিরে', 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', এবং 'আনন্দ ধারা', সংকট থেকে মুক্তি এবং উত্তরণের পথও উপস্থাপন করেছেন। সেখানে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতিফলন রয়েছে। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র নৈতিক দিক থেকে নয়, বরং মানব মন এবং আত্মার গভীরতাকে আবিষ্কার করে, যা শেষ পর্যন্ত মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করে।

ফ্রয়েডের থিওরি অনুসারে, মানব মন সর্বদা ইড এবং সুপার ইগো এর দ্বন্দ্বে আবদ্ধ থাকে, যেখানে আমাদের অন্তর্নিহিত কামনা এবং সংস্কৃতির বিধি-নিষেধের মধ্যে এক ভীষণ সংঘাত চলে। 'বিবর' এই দ্বন্দ্বের গভীর অনুসন্ধান, স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার খেলাকে উপস্থাপন করে, এবং একজন নায়কের যাত্রাকে চিত্রিত করে যে অবশেষে তার অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে এগিয়ে যায়।

তথ্যসূত্র:

১। https://www.anandapub.in/book-details/2141

২। বিশ্বাস, দিলীপ কুমার, বিবর উপন্যাসে অশ্লীলতা বিষয়ে দেশ পত্রিকায় লেখা একটি চিঠি, দেশ, অক্টোবর ১৩, ১৯৬৫, 'সমরেশ বসু রচনাবলী', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা ৫৫১।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫১।

৪। দাসমুন্সী, শুভেন্দু, 'বিবর আত্মদর্শন?', এইসময় অনলাইন, প্রকাশ ২৩ অগাস্ট, ২০১৫, সময় বিকেল ৩.০৩, লিঙ্ক https://eisamay.com/cover-story/article-on-indecency-of-bibor-novel-by-late-samaresh-basu/48640498.cms

৫। ঐ।

৬। ঐ।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, 'সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬৭।

৮। বসু, সমরেশ, 'বিবর', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২০, পৃষ্ঠা ১।

৯। শিকদার, অশ্রুকুমার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩০৫।

১০। বসু, সমরেশ, 'বিবর', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২০, পৃষ্ঠা ১০৫।

১১। ঘোষ, প্রসূন, 'উপন্যাসের নানা স্বর', এবং মুশায়েরা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, 'সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৭১।

১৩। দাসমুন্সী, শুভেন্দু, 'বিবর আত্মদর্শন?', এইসময় অনলাইন, প্রকাশ ২৩ অগাস্ট, ২০১৫, সময় বিকেল ৩.০৩, লিঙ্ক https://eisamay.com/cover-story/article-on-indecency-of-bibor-novel-by-late-samaresh-basu/48640498.cms

১৪। ঐ।

১৫। ঐ।